নিবেদিতাকে স্বামীজী কেন ভারতে এনেছিলেন

স্বামী বলভদ্রানন্দ

১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনের এক অতিশীতল সন্ধ্যায় নিবেদিতা প্রথম স্বামীজীকে দেখেছিলেন। তখন তিনি মার্গারেট নোবল। কিন্তু জন্মের পূর্ব থেকেই তিনি ঈশ্বরের চরণে নিবেদিত। তিনি যখন মাতৃগর্ভে, তখনই তাঁর ভক্তিমতী জননী মেরি ইসাবেল ভগবানের কাছে জানিয়েছিলেন, সন্তানটি যদি নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে তিনি তাঁকে তাঁর উদ্দেশেই অর্পণ করবেন। নির্বিঘ্নে পৃথিবীর আলো দেখেছিল রত্নশিশুটি; এবং নিশ্চয়ই মনে মনে তাঁর কথা রেখেছিলেন মা মেরি ইসাবেল।

ভারতের কথা মার্গারেট প্রথম শুনেছিলেন তাঁর ধর্মযাজক পিতার এক ধর্মযাজক বন্ধুর কাছে। তিনি ভারতে কিছুদিন ছিলেন। তাঁর মুখেই একদিন ছয়-সাত বছরের বালিকা মার্গারেট ভারতের সপ্রশংস উল্লেখ শুনলেন। তিনি চলে যাওয়ার পরেই মার্গারেট পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভারতবর্ষ কোথায়। পিতা মানচিত্রে দেখিয়ে দিলেন কোথায় ভারত। পরম মমতায় মার্গারেট মানচিত্রের 'ভারতে'র ওপর হাত বোলালেন। পিতা স্যামুয়েল সেইসময় থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর অত্যন্ত স্নেহের জ্যেষ্ঠা কন্যাটি সাধারণ নন। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে যক্ষ্মারোগে দেহত্যাগের সময় তিনি সহধর্মিণীকে বলে গিয়েছিলেন, একদিন মার্গারেটের জীবনে বিরাট এক আহ্বান আসবে; তখন যেন তিনি তাঁকে আটকে না রাখেন। লিজেল রেমঁ-র নিবেদিতা-জীবনীতে আছে, ইসাবেলকে তিনি আরও বলেছিলেন, ''She will spread her wings... she will do great things.'' মার্গারেটের বয়স তখন দশ।

এর আঠারো বছর পর স্বামীজীর সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম সাক্ষাৎ। তখন দুবছরের কিছু অধিককাল ধরে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করে স্বামীজী মাত্র মাস দুয়েক হল লন্ডনে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং লন্ডনের বুদ্ধিজীবী মহলকেও আপ্লুত করেছেন। মার্গারেটের বন্ধু ইসাবেল মার্গেসন স্বামীজীর কয়েকটি বক্তৃতা শুনেছিলেন এবং তাঁকে একটি ঘরোয়া সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মার্গারেটের মননশীলতা ও ধর্মপ্রাণতার কথা জানতেন বলে তাঁকেও আমন্ত্রণ করেছিলেন সেই সভায় উপস্থিত থাকতে। তাঁর বয়স তখন আঠাশ। সতেরো বছর বয়স থেকে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেছেন। এগারো বছর ধরে চার-পাঁচটি

সহকারী সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে উইম্বলডনে নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি শিশুদের স্কুল। তিনি তখন একজন শিক্ষিকা, শিক্ষাতাত্ত্বিক, লেখিকা ও বাগ্মী হিসেবে লন্ডনের বুদ্ধিজীবী সমাজে বিখ্যাত। টমাস হাক্সলি, বার্নার্ড শ প্রভৃতি প্রথিতযশা মানুষের উপস্থিতিতে তিনি সমানে সমানে নিজের বক্তব্য রাখেন। প্রতিষ্ঠা, পরিচিতি, সম্মানজনক মনোমতো কর্মক্ষেত্র—যা-কিছু বাহ্যজগতে একজন মানুষের কাঙ্ক্ষিত, সব তাঁর আছে। কিন্তু অন্তর্জগতে তাঁর অনেক সংশয়, অনেক প্রশ্ন। তিনি আজন্ম আধ্যাত্মিক ভাবে পরিচালিত। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম তাঁকে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি, তাই বৌদ্ধধর্ম চর্চা করেছেন। তবুও সব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। এই সময়েই স্বামীজীকে তাঁর প্রথম দর্শন। স্বামীজী বসেছিলেন মাটিতে, ভারতীয় ভঙ্গিতে সুখাসনে, ফায়ার প্লেসের সামনে। তাঁর সামনে পনেরো-ষোলো জন শ্রোতা অর্ধবৃত্তাকারে বসেছিলেন। আর কোনওদিন মার্গারেট পাশ্চাত্যে স্বামীজীকে এভাবে মাটিতে বসে ধর্মপ্রসঙ্গ করতে দেখেননি। পরে ভারতে এসে ভারতের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রথম সাক্ষাৎসন্ধ্যাটিকে যখন মনে মনে পুনরবলোকন করেছেন, তখন তাঁর মনে হয়েছে, ওই চিত্রটি যেন ভারতবর্ষের গ্রামের কোনও এক সন্ধ্যার দৃশ্যেরই প্রতিফলন : কোনও এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের পথে রাতটুকুর জন্য আশ্রয় নিয়েছেন কোনও মন্দিরে কিংবা কুয়োর কাছে গাছতলায়; প্রদীপ বা ধুনি জ্বলছে সাধুর কাছে; সরল ভক্তিমান গ্রামবাসীরা তাঁর চারপাশে অর্ধবৃত্তাকারে বসে তাঁর মুখ থেকে ধর্মকথা শুনছে। ভারতেরই এক খণ্ডচিত্র যেন লন্ডনের ওই অভিজাতগৃহে সেদিন আবির্ভূত হয়েছিল। অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও স্বামীজী যেন একযোগেই মার্গারেটের জীবনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মার্গারেট স্বামীজীর কথা শুনছিলেন এবং মনোযোগ দিয়ে তাঁকে লক্ষ করছিলেন। তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে দেখলেন gentleness ও loftiness—মৃদুতা ও ঊর্ধ্বমুখীনতা; সেইসঙ্গে মা মেরির কোলের শিশু যিশুর সারল্য—যেটি অপূর্বভাবে চিত্রিত হয়ে রয়েছে রাফায়েলের অঙ্কনে। মার্গারেটের মনে হল, ইনি নিশ্চয়ই প্রতিদিন বহুক্ষণ ধ্যানে অতিবাহিত করেন। আমরা জানি, মার্গারেটের এই ধারণা কত অভ্রান্ত। আর স্বামীজী সেদিন যা বললেন তাতে তাঁর মনে হল, তিনি জীবনে যেসব চিন্তাকে উৎকৃষ্ট বলে জেনেছেন সেগুলি সবই সেদিন স্বামীজী ওই ঘণ্টাখানেকের বক্তব্যের মধ্যে পরিবেশন করেছেন। এরপরে লন্ডনে স্বামীজীর শেষ দুটি ভাষণও মার্গারেট মন দিয়ে শুনলেন। স্বামীজী আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার আগেই মার্গারেট তাঁকে 'মাস্টার' অর্থাৎ 'আচার্যদেব' সম্বোধন করতে শুরু করেছিলেন।

'The Master as I Saw Him' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন, স্বামীজীর চরিত্রের বীরোচিত দিকটি প্রথমবারের এই তিনটি সাক্ষাৎকারের সময়ই তিনি চিনে নিতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে সবচেয়ে শ্রদ্ধালু করেছিল স্বামীজীর অনুপম চরিত্রটি। স্বদেশবাসীর প্রতি স্বামীজীর তীব্র ভালবাসাটিও তিনি তখনই অনুভব করেছিলেন এবং তখনই তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল যে, স্বামীজীর স্বদেশপ্রেমের সেবায় তিনি নিজেকে নিবেদন করবেন। স্বামীজীর ভারতপ্রেমের প্রভাব এমনই অমোঘ ছিল। সিস্টার ক্রিস্টিন ও তাঁর সহযোগীদের ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটেছিল। ক্রিস্টিন লিখেছেন, ''আমাদের ভারতপ্রেমের জন্ম হয়েছিল ঠিক তখন থেকে, যখন আমরা প্রথম তাঁর সেই অপূর্ব কণ্ঠে 'India' শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনলাম। এটা অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, পাঁচ অক্ষরের একটি ছোট শব্দের মধ্যে এত ভাব ভরিয়ে দেওয়া যায়।''

ভারতে ফেরার পথে স্বামীজী আবার লন্ডনে

আসেন ১৮৯৬-এর এপ্রিলে, থাকেন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এবার মার্গারেট স্বামীজীর প্রতিটি ভাষণ শুনলেন, স্বামীজীর সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠ ও বিস্তৃতভাবে চিন্তার আদানপ্রদান হল তাঁর। তিনি চাইছিলেন তখনই তিনি স্বামীজীর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বামীজীর কাজের পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে জানবার জন্য তিনি স্বামীজীকে একটি চিঠি লিখলেন। উত্তরে ৭ জুন ১৮৯৬ তারিখে স্বামীজী লিখলেন, ''আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এই : মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করা এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দেওয়া।'' ওই চিঠিতেই তিনি তাঁকে বললেন, ''তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরও অনেক শক্তি আসবে।'' কিছুদিন পর স্বামীজী তাঁকে স্পষ্টই বললেন, ''আমার দেশের মেয়েদের জন্য আমার একটা পরিকল্পনা আছে এবং আমার মনে হয়, তুমি সেই কাজে আমাকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করতে পার।'' কিন্তু তখনও তিনি তাঁকে ভারতে আসার অনুমতি দেননি। স্বামীজী ভারতে ফিরে গেলেন। মার্গারেট লন্ডনে থেকেই স্বামীজীর কাজ করে চললেন।

কিন্তু মন তাঁর উন্মুখ হয়ে ছিল ভারতে যাওয়ার জন্য। আহ্বান অবশেষে এল। ২৯ জুলাই ১৮৯৭ মার্গারেটকে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখলেন, ''এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।''

ওই চিঠিতেই স্বামীজী একাধিকবার বলেছেন : তোমাকে কিন্তু একা চলতে হবে। কারও উপর নির্ভর করলে চলবে না। মিসেস সেভিয়ার, মিস মুলার—কারও ওপর না। এর কারণ, মার্গারেটের মধ্যে স্বামীজী যে জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি দেখেছিলেন, কারও অধীন চললে বা কাউকে অনুকরণ করলে, সেই বিশাল শক্তির বিকাশ ও প্রকাশ খণ্ডিত ও বিকৃত হয়ে আকাঙ্ক্ষিত সুফল প্রসবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। বস্তুত, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর 'নরেন'কে যে-স্বাধীনতা দিয়ে তাঁর যথোচিত বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, সে-স্বাধীনতা স্বামীজী মার্গারেটকেও দিতে চেয়েছিলেন—মার্গারেটের 'নিবেদিতা'য় সার্থক উত্তরণের প্রয়োজনে।

মার্গারেট ভারতে এলেন ১৮৯৮-র ২৮ জানুয়ারি। স্বামীজী প্রথমে স্টার থিয়েটারে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করলেন। সেই বক্তৃতা কলকাতায় যথেষ্ট সাড়া ফেলল। তাঁর শিক্ষা, বিনয় ও ভারতপ্রাণতা সবাইকে মুগ্ধ করল। এর কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামীজী মার্গারেট, মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস বুলকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পাঠালেন। মা শুধু মার্গারেটদের পরম স্নেহে গ্রহণই করলেন না, তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে খেলেনও। প্রায় সমসাময়িক কালেই (১৮৯০ সালে) খ্রিস্টানদের সঙ্গে একই চায়ের আসরে চা খেয়েছিলেন বলে তিলক এবং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডেকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। মায়ের এই উদারতা ও সাহসিকতায় স্বামীজী তাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আনন্দে বিস্ময়ে গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দজীকে তিনি লিখেছিলেন : ''ভাবতে পারো, মা তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে খেয়েছিলেন! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?''

নিবেদিতার রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে একটি অদ্ভুত ঘটনা রয়েছে স্বামী ভূমানন্দ-লিখিত শ্রীমায়ের জীবনীতে। ঘটনাটি আমি

পেয়েছি শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত রূপে। নিবেদিতা তখন কয়েকমাস হল কলকাতায় এসেছেন। মা আছেন বাগবাজারের ১০/২ বোসপাড়া লেন-এ। নিবেদিতা সেদিন বাঙালি মেয়েদের মতো শাড়ি পরে এসেছেন, তাদেরই মতো করে পিঠের আঁচলে বেঁধেছেন একগোছা চাবি। নিবেদিতা তখন ভাঙা ভাঙা বাংলায় মায়ের সঙ্গে কথা বলতে শিখেছেন। মায়ের একেবারে কাছ ঘেঁষে বসে শিশুর মতো আনন্দে কথা বলছেন, কিন্তু আঁচল-শুদ্ধ চাবির গোছা বার বার সশব্দে কোলের মধ্যে এসে পড়ে তাঁকে বড়ই বিব্রত করছে। মা তাঁর অবস্থা দেখে হেসে বললেন, ''বাইরেও সাদা, ভেতরেও সাদা।'' নিবেদিতা জানতে চাইলেন এই কথার মানে। মা বললেন, ''এটা ঠাকুরের কথা। ঠাকুর একদিন শুয়েছিলেন, আমি তাঁর খাবার নিয়ে গিয়ে দেখি, তিনি ঘুমোচ্ছেন। খাবারের থালাটি তাঁর পাশে রেখে আমি নিঃশব্দে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠাকুর একসময় চোখ খুলে বললেন, 'খাবার এনেছ? জানো, আমি এমন একটা দেশে চলে গেছিলাম, যেখানকার প্রত্যেকের বাইরেটাও সাদা ভেতরটাও সাদা।' '' নিবেদিতা জানতে চাইলেন : কোথায় এবং কবে তিনি একথা বলেছিলেন। মা বললেন, ''দক্ষিণেশ্বরে। সেদিন ছিল রথযাত্রা।'' নিবেদিতা সাগ্রহে বছর ও দিন লিখে নিয়ে গেলেন। এরপরে তিনি ঠাকুরের গৃহী ভক্ত ড. শশিভূষণ ঘোষের সঙ্গে দেখা করে বাংলা-ইংরেজি সন-তারিখ মিলিয়ে দেখলেন। দুদিন পরে মায়ের কাছে এসে নিবেদিতা বললেন, ''মা, ঠাকুর যেদিন তোমাকে ওই কথা বলেছিলেন, সেদিনই আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমি ডায়েরিতে সেই তারিখটা লিখে রেখেছিলাম এবং এখন মিলিয়ে দেখলাম, সেদিনই আমি তাঁকে স্বপ্ন দেখি। স্বামীজী আমাদের দেশে তার অনেক পরে এসেছেন। আমি স্বামীজীকে আমার এই স্বপ্নের কথা বলেছি এবং আমার ডায়েরিও দেখিয়েছি।'' মা শুনে নিবেদিতাকে বললেন, ''তুমি নরেনের মেয়ে, তাই ঠাকুর তোমাকে দেখা দিয়েছেন।''

স্বামীজী ২৫ মার্চ ১৮৯৮ তারিখে মার্গারেটকে দীক্ষা দিলেন ও নাম রাখলেন 'নিবেদিতা'। পরের বছর ওই ২৫ মার্চ তারিখেই তিনি তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে অভিষিক্ত করলেন।

নিবেদিতা ভারতে আসার পরে পরেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন জনের কাছে স্বামীজী তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছিলেন, যেমন : ''নিবেদিতা গুরুগিরি করতে আসেনি, প্রাণ দিতে এসেছে''; "India shall ring with her."—সমগ্র ভারত তাঁর ভাবে স্পন্দিত হবে অর্থাৎ সমগ্র ভারত তাঁকে সানন্দে মানবে ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হবে; ''আমি যদি আজ মরে যাই, আমার কাজ এ (নিবেদিতা) চালিয়ে নিয়ে যাবে।''

স্বামীজী 'আমার কাজ' বলতে কী বুঝিয়েছিলেন সেটা একটু দেখতে চেষ্টা করি। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে প্রধানত তিনটি কাজ দিয়ে গিয়েছিলেন। একটি হল : সঙ্ঘ তৈরি। দেহত্যাগের আগে তাঁর সন্ন্যাসী-শিষ্যদের দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন, ''দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধন ভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।'' তাই তিনি মা-ভাইদের আর্থিক কষ্ট, পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমা—সবকিছুর মধ্যেও গুরুভাইদের একটা আস্তানা করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। প্রমদাদাস মিত্রকে লিখেছেন, ''আমার উপর তাঁর আদেশ এই যে, এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব।''

দ্বিতীয় কাজটির কথা স্বামীজী পরিব্রাজক জীবনে স্বয়ং বলেছিলেন হাতরাস স্টেশনের সহকারী

স্টেশনমাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তকে—স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণ করে পরবর্তী কালে যাঁর নাম হয় স্বামী সদানন্দ। একদিন শরচ্চন্দ্র দেখলেন, তাঁর অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল গুরু বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। কারণ জিজ্ঞেস করায় স্বামীজী তাঁকে বললেন, ''দেখ বাবা, আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ব্রত আছে, অথচ আমার ক্ষমতা এত অল্প যে, আমি ভেবেই আকুল—কি করে এটা উদ্‌যাপিত হবে। এ ব্রত পরিপূর্ণ করার আদেশ আমি গুরুর কাছে পেয়েছি—আর সেটা হচ্ছে মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা।'' প্রধানত এই দ্বিতীয় কাজটির জন্য স্বামীজী নিবেদিতাকে ভারতে এনেছিলেন। ভারতকে জাগানোর কাজটিই স্বামীজী নিবেদিতার উপরে দিয়েছিলেন এবং সেই সম্বন্ধেই তিনি বলেছিলেন, ''আমি মরে গেলে নিবেদিতা আমার কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে।'' নিবেদিতা তাঁর অবর্তমানে 'রামকৃষ্ণ মঠ' ও 'রামকৃষ্ণ মিশনে'র দায়িত্ব নেবেন—একথা স্বামীজী কখনও ভাবেননি বা তার জন্য স্বামীজী তাঁকে ভারতে আনেননি। ২৯ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে লেখা স্বামীজীর পূর্বোদ্ধৃত চিঠিটি আমরা এই প্রসঙ্গে আবার উল্লেখ করতে পারি। স্বামীজী সেখানে স্পষ্ট লিখেছেন : 'ভারতের জন্য' এবং 'বিশেষ করে ভারতের নারী-সমাজের জন্য' নিবেদিতা-নামক সিংহীকে তিনি চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সম্বন্ধে তিনি জানতেন যে, তাঁর যোগ্য সন্ন্যাসী গুরুভাইরা আছেন, তাঁরা তা চালিয়ে নেবেন তাঁর অবর্তমানে। বাস্তবেও তাই হয়েছে—স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরে ঠাকুরের হাতে এবং স্বামীজীর সাহচর্যে গড়া এই মহাপুরুষেরাই সঙ্ঘ পরিচালনার কাজটি সার্থকভাবে করে গেছেন ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এবং ততদিনে সঙ্ঘের পরবর্তী প্রজন্মকেও তাঁরা যোগ্যরূপে তৈরি করে গেছেন। অপরদিকে নিবেদিতাও স্বামীজীকে দেওয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভারত-পুনরুজ্জীবনের কাজটি সার্থকভাবে করে চলেছেন তাঁর নিজের দেহান্ত পর্যন্ত। যেমন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-পরিচালনার কাজ নিবেদিতার পক্ষে পালন করা সম্ভব হত না (যদিও তিনি সঙ্ঘকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন ভারতে আসবার আগে থেকেই), তেমনি স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরুভাইদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না ভারত-জাগরণের কাজটি গ্রহণ করা, যদিও তাঁদের অনুপম জীবনের শক্তি, সেবা ও প্রেরণা এই সঙ্ঘের মাধ্যমে ভারত-জাগরণে সাহায্য করেছে সর্বদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটি কাজের স্পষ্ট দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় নরেনকে। আমরা এটির সম্বন্ধে বলে থাকি, ঠাকুর চাপরাস দিয়েছিলেন স্বামীজীকে; ক্যাম্পারে যখন তিনি রুদ্ধকণ্ঠ তখন একটুকরো কাগজে লিখে দিয়েছিলেন : ''নরেন শিক্ষে দিবে। যখন ঘুরে বাহিরে হাঁক দেবে।'' ভারত তথা শ্রীরামকৃষ্ণ তথা ভারতের সনাতন শাস্ত্রের বাণী—বিবেকানন্দই প্রচার করবেন দেশে ও বহির্ভারতে। বিবেকানন্দকে দেওয়া এই তৃতীয় কাজটিও শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীসারদা-বিবেকানন্দের অনন্য ভাষ্যকার হয়ে বিবেকানন্দের অবর্তমানে দেশবাসীর জন্য সবচেয়ে ব্যাপকভাবে করেছেন নিবেদিতা।

স্বামীজী নিজে বলেছেন, নিবেদিতার নির্মাণে তিনি সবচেয়ে সময় ব্যয় করেছেন। তা এই ভারতসংক্রান্ত কাজের জন্যই। নিবেদিতা ভারতে আসার অল্প পরেই স্বামীজী তাঁকে নিজের হিমালয় ভ্রমণের অন্তর্ভুক্ত করে বলেছিলেন, ''Come with me on this journey. You are now one, I will make you twenty''—আমার সঙ্গে এই ভ্রমণে এসো; তুমি 'এক' আছ, 'কুড়িগুণ' শক্তিশালী করে দেব তোমাকে। এই ভ্রমণকালে প্রধানত এবং পরবর্তী কালেও সর্বদা স্বামীজী তাঁর ভারতসংক্রান্ত চিন্তা উজাড় করে দিয়েছিলেন নিবেদিতার কাছে। শাস্ত্র বলেন, গুরু শিষ্যের নয়ন-উন্মীলন করে জ্ঞানদৃষ্টি দেন। আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে নিবেদিতার অন্তর্জগতের ক্ষেত্রে স্বামীজী

নিশ্চয়ই তা করেছিলেন। নিবেদিতার ধ্যানপ্রিয় ভক্তিময় জীবন; মিস ম্যাকলাউডকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর উক্তি : 'আমি পরিষ্কার বুঝেছি দেহ আর আমি আলাদা'; স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্তব্য : 'নিবেদিতা কাছে এলেই মনটা হু হু করে উপরে উঠে অন্তর্মুখ হয়ে যেত'—প্রভৃতি থেকে তার সামান্য আভাস পাই। কিন্তু আমরা এখানে নিবেদিতার ভারতপ্রাণতার কথা বলছি। নিবেদিতার ভারতপ্রাণতা ও ভারতদৃষ্টি স্বামীজীর দান। স্বামীজীর ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত একবার বিস্মিত হয়ে নিবেদিতাকে বলেছিলেন, ''আপনি কী করে ভারতকে এত গভীরভাবে বুঝলেন? আর কোনও ইউরোপীয়কে তো এরকম দেখিনি!'' নিবেদিতা উত্তর দিয়েছিলেন, ''অন্য ইউরোপীয়রা ভারত চিনেছে কার কাছে? আর আমাকে ভারত চিনিয়েছেন কে?'' নিবেদিতার 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থেই আমরা দেখেছি, স্বামীজী একবার নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, ''I am condensed India''—আমি ঘনীভূত ভারতবর্ষ। সেই মূর্তিমান ভারতবর্ষের কাছে ভারতবর্ষ চিনেছিলেন বলেই নিবেদিতা ভারতের মর্মবাণী যথাযথভাবে অনুধাবন করে যথার্থ ভারত-সেবিকা ও ভারত-পূজারিণী হতে পেরেছিলেন।

নিবেদিতার ভারত-সেবার কাজ শুরু বাগবাজার পল্লীর ওই ছোট বালিকা বিদ্যালয়টির মাধ্যমে। আয়তন বা ছাত্রীসংখ্যা দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নিবেদিতার বিদ্যালয়টির সঠিক মূল্যায়ন করা যাবে না। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজীর শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ প্রথম হাতে-কলমে রূপায়িত করেছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে, তেমনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শিক্ষাদর্শকে সর্বপ্রথম হাতে-কলমে রূপায়িত করেছেন নিবেদিতা। শুধু নারীশিক্ষা নয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই নিবেদিতা পথিকৃৎ এবং ভারতের ক্ষেত্রেও তাই।

নিবেদিতা যখন এদেশে এসেছেন, তখন ভারতবর্ষের রাজধানীতে (অর্থাৎ কলকাতায়) এবং ভারতবর্ষেও তাঁর মাপের শিক্ষাবিদ—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দুই গোলার্ধের শিক্ষাভাবনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি—আর কেউ সম্ভবত ছিল না। যোগ্যতম হাতেই স্বামীজী দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ভারতের জাগরণের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন শিক্ষার এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নারীশিক্ষার, কারণ জগৎ নারীর হাতেই মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্বটি দিয়েছে। নিবেদিতার মাধ্যমে স্বামীজী সেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই সর্বপ্রথম শুরু করেছিলেন—'First things first'। সেইসময় কলকাতায় মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দু-একটি ছিল : বেথুন সাহেবের স্কুল, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, মহাকালী পাঠশালা প্রভৃতি। কিন্তু এই স্কুলগুলি হয় সম্পূর্ণ অতীত বিরোধী, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির বিরোধী, নয়তো বা সম্পূর্ণভাবে অতীতপ্রাণ এবং সমস্ত আধুনিকতার বিরোধী। স্বামীজী যে-জাতীয় ধারায় শিক্ষার কথা নিবেদিতার কাছে বলেছিলেন, তার চরিত্রবৈশিষ্ট্যটি স্বামীজী এই ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন, ''To nationalise the modern and to modernise the old''—আধুনিকের মধ্যে যেগুলি সারগর্ভ, সেগুলিকে জাতীয় ধারায় সম্পৃক্ত করা আর প্রাচীনের সারগর্ভ বস্তুগুলিকে তাদের সারবত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে প্রয়োগের দিক থেকে আধুনিক করে তোলা। নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় (যাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ স্কুল, এখন যা পরিচিত 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়' নামে) জাতীয় ধারায় আধুনিক শিক্ষাদানের প্রথম বিদ্যালয়—যার মধ্যে প্রাচীন বিদ্যা ও আধুনিক বিদ্যাকে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে যথার্থভাবে সম্মিলিত করা হয়েছে। নিবেদিতার

মহাপ্রয়াণের পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকা লিখেছিল : আমরা প্রত্যেকেই কিছুদিন ধরে সচেতন হয়েছিলাম, দেশের প্রয়োজনে শিক্ষার অতিশয় গুরুত্বের বিষয়ে। কিন্তু সেই শিক্ষার বাস্তব রূপটি কী হবে, সেটি নিবেদিতা আমাদের প্রথম দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। 'বেঙ্গলী'র এই মন্তব্যটিকে আমরা নিবেদিতার ওই আপাত ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টির মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা-সেবার যথার্থ মূল্যায়ন বলে গ্রহণ করতে পারি। আদর্শ শিক্ষার চরিত্রবৈশিষ্ট্যটি কী, সেটি রামকৃষ্ণ মিশন তথা সারা ভারতবর্ষের জন্য নিবেদিতাই সর্বপ্রথম দেখিয়ে দিয়ে গেছেন—অবশ্যই স্বামীজীর ভাবে ও প্রেরণায় সম্পৃক্ত হয়ে।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা অনুভব করেন, তাঁর কাজ জাতিগঠন। স্বামীজী যে তাঁর মধ্যে 'জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি' দেখেছিলেন, তিনি এখন তাঁর স্ফুরণ অনুভব করতে থাকেন। স্বামীজীর দেহত্যাগ তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল স্বামীজীর 'বিজয়ী প্রত্যাবর্তন' রূপে। সমগ্র দেশ যেন নতুন করে তাঁর চর্চা করতে শুরু করেছে—যেমন করেছিল তাঁর শিকাগোকীর্তি ও ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর। এই সুযোগটিকে গ্রহণ করে নিবেদিতা সারা ভারতে স্বামীজীর বাণী প্রচার করবার জন্য বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। সেই বক্তৃতাগুলির মধ্য থেকে, ১৯০২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মুম্বাইতে তিনি যে-বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, সেটির দুটি পঙ্‌ক্তি বেছে নিচ্ছি বিশেষ উদ্দেশ্যে : ''...these two souls (Ramakrishna and Vivekananda) were indeed one great soul manifested into two souls for regenerating and rejuvenating Indian life.'' কিছুক্ষণ পরে ওই বক্তৃতাতেই তিনি সমগ্র জগতের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, ''These two Sannyasis dedicated their whole lives to the service of the whole world–to the redemption of the whole world.''—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দুটি ভিন্ন মূর্তিতে এক অভিন্ন শক্তি; আবির্ভূত হয়েছেন ভারতীয় জীবনকে নবজাগ্রত ও নবপ্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করতে। শুধু ভারতই নয়, সমগ্র জগতের সেবায় এঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত। সারা জগতের মুক্তির জন্য নিবেদিত হয়েছে এই দুই সন্ন্যাসীর জীবন। নিবেদিতার এই কালের সব বক্তৃতার সুরই ছিল এটি। এই তানেই তিনি ভারতীয় যুবকদের প্রাণকে ভারতের দিকে তথা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দিকে আকর্ষণ করে চলেছিলেন ভারতের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে নিয়োজিত হতে—বিশ্বের প্রয়োজনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও ভারতের পরবর্তী ভূমিকার কথা বিস্মৃত না হয়ে। কাজেই, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীকে যুবকদের কাছে ব্যাপকভাবে বহন করে নিয়ে যাওয়ার পেছনে নিবেদিতার বিরাট অবদান। প্রসিদ্ধ বিবেকানন্দ-নিবেদিতা-সুভাষচন্দ্র গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু দেখিয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন : ''ভারতের জাতীয় জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ যে-দুটি বজ্রবাহুর মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করেছেন, তার একটি হল নিবেদিতা, অপরটি সুভাষচন্দ্র।'' এই দুজনের মধ্যেও নিবেদিতার ভূমিকা অগ্রণীর, যেটি স্পষ্ট সুভাষচন্দ্রের এই উক্তিতে : ''ভারতবর্ষকে আমি ভালবেসেছি বিবেকানন্দ পড়ে। আর বিবেকানন্দকে আমি চিনেছি নিবেদিতার লেখায়।''

এই সময় নিবেদিতা ভারতের সমস্ত সমস্যার মূল সমাধান হিসেবে একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন—সেটি হল ভারতীয় জাতীয়তার তত্ত্ব। জাতীয়তার কথা অনেকে বলেছেন—কিন্তু নিবেদিতার ভারতীয় জাতীয়তা তত্ত্ব সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এই জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা বিরোধী নয়, আন্তর্জাতিকতা অভিমুখীন। এই জাতীয়তা যে-আন্তর্জাতিকতার কথা বলে, সেই আন্তর্জাতিকতাও

জাতীয়তাবিহীন নয়, জাতীয়তাভিত্তিক। এই জাতীয়তা ভারতবর্ষের সব ধর্মের সব সংস্কৃতির মানুষের জন্যই; শুধু গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের জন্য নয়। সংখ্যায় যারা কম, সেই ধর্ম বা সেই সম্প্রদায়ের মানুষের প্রয়োজন ও মর্যাদাও এই ব্যাপক জাতীয়তাবোধটির দ্বারা রক্ষিত হবে। নিবেদিতা মনে করতেন : প্রকৃত জাতীয়তার জাগরণের কাছে দেশের অন্য সব সমস্যা গৌণ। কারণ, শিক্ষার অভাব, আর্থিক কষ্ট, ধর্মে ধর্মে বিবাদ, সামাজিক সমস্যা এরকম সব আলাদা আলাদা গুরুতর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যদি ভারতবর্ষের মানুষ জাতীয়তার ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়—প্রকৃত অর্থে 'national' হয়ে ওঠে। মিস ম্যাকলাউডকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জাতীয়তার স্বরূপ ও সম্ভাবনার কথা লিখেছেন (১৪ এপ্রিল ১৯০৩) : ''বর্তমানে প্রকৃত কাজ হচ্ছে, সর্বপ্রকার তাৎপর্য ও অর্থবোধের সঙ্গে ভারতের সর্বত্র 'জাতীয়তা' শব্দটি প্রচার করা। এই বিরাট চেতনা যেন সবসময় ভারতকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে থাকে। এই জাতীয়তার দ্বারাই হিন্দু ও মুসলমান দেশের প্রতি এক গভীর অনুরাগে একত্র হবে। এর অর্থ— ইতিহাস ও প্রচলিত রীতিনীতিকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখা; ধর্মের মধ্যে সমগ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনার সমাবেশ— সর্বধর্মসমন্বয়। বুঝতে হবে যে, রাজনৈতিক প্রণালী ও অর্থনৈতিক দুর্বিপাক গৌণমাত্র, ভারতবাসীর দ্বারা ভারতের জাতীয়তা উপলব্ধিই হল প্রকৃত কাজ।''

নিবেদিতা অন্যত্র বলেছেন, ঠিক যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্র না পড়ে, শাস্ত্র থেকে কোনও উদ্ধৃতি না দিয়েও শাস্ত্রের জীবন্ত মূর্তি হয়ে উঠেছেন—তাঁকে জানা মানেই শাস্ত্রের মর্মার্থ জানা, ঠিক তেমনই স্বামীজী 'জাতীয়তা' বা 'nationality' কথাটি মুখে না বললেও তিনি যা বলেছেন এবং করেছেন, তার দ্বারা তিনি জাতীয়তার জীবন্ত বিগ্রহ হয়ে উঠেছেন। নিবেদিতার জাতীয়তা-তত্ত্ব— স্বামীজীরই জীবনের নির্যাস।

জাতীয়তা সম্বন্ধে নিবেদিতা একজায়গায় এই ভাবের কথা বলেছেন : বেদ-উপনিষদের যুগে যে-শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, ভারতের রাজা-রাজর্ষি ও মহাবীর-মহাসাধক-সাধিকাদের মধ্য দিয়ে যে-শক্তি যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়েছে সেই শক্তিই আজ আধুনিক কালে পুনর্জাগরিত হয়েছে এবং তারই নাম জাতীয়তা। এ থেকে মনে হয়, সমগ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শকেই নিবেদিতা 'জাতীয়তা' নামে অভিহিত করেছেন। এর আগে উদ্ধৃত মুম্বইয়ের বক্তৃতাটিতেও আমরা দেখেছি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যেই তিনি ভারত তথা পৃথিবীর মুক্তির পথ আছে বলে মনে করেছেন।

নিবেদিতার জাতীয়তার দর্শনকে নিবেদিতা বলেছেন 'cosmo nationalism.' এই জাতীয়তার বোধ থেকেই মানুষ আন্তর্জাতিকতায় উন্নীত হবে, কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক মানুষের অন্তর থেকে জাতীয়তা কোনওদিনই চলে যাবে না। নিবেদিতা বলতেন, আন্তর্জাতিকতা থেকে শুরু করে জাতীয়তায় পৌঁছনো সঠিক পথ নয়। জাতীয়তার পথ ধরে আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছনোই সঠিক পথ। ''স্বদেশপ্রীতি যখন হৃদয়ে দৃঢ় হয়ে দেশের সংস্কৃতি ও আদর্শকে গর্বের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, তখনই অপর জাতির মহত্ত্ব ও উচ্চ আদর্শের যথার্থ মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয়। নইলে আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে অপর জাতির অনুকরণ চরিত্রকে নিকৃষ্ট করে ফেলে।''—নিবেদিতার কথা।

দুঃখের বিষয়, নিবেদিতার জাতীয়তা-দর্শন বইয়েই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। আজ বহু চিন্তাশীল মানুষের কাছে জাতীয়তার দর্শন সংকীর্ণ দর্শন। ভারতে একদল মানুষ জাতীয়তা-ভাবনাটিকে নিন্দা ও উপহাস করে। আর একদল আবার উগ্র জাতীয়তার কথা বলে এবং কিছু কিছু সম্প্রদায়কে

ভারতীয় জাতীয়তার বাইরে রেখে জাতীয়তার রূপায়ণ চায়। নিবেদিতার জাতীয়তা-দর্শন এ-উভয় থেকেই স্বতন্ত্র। এতে জাতীয়তার নিষ্ঠা, গভীরতা, শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিকতার সবটুকু আছে, কিন্তু উগ্র জাতীয়তার হিংসা ও সংকীর্ণতা নেই। তাই এই জাতীয়তা সর্বার্থসাধক। কিন্তু এটি দেশের অতি সামান্য সংখ্যক মানুষ শুধুমাত্র পড়েছে এবং সম্ভবত কেউই একে রূপায়িত করার কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। অথচ এর বাস্তবায়ন হলেই স্বামীজীর স্বপ্নের আদর্শ ভারতও বাস্তব হয়ে উঠবে।

কিন্তু কোথা থেকে শুরু করা যেতে পারে নিবেদিতার জাতীয়তা-দর্শনের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া? আমরা সেটি খুঁজে দেখি।

নিবেদিতা লিখছেন, জাতীয় দায়িত্ব (National Responsibility) নির্ভর করে নাগরিক কর্তব্য (Civic duty) পালনের উপর। তিনি বলছেন, যে-লোক নিজের গ্রামের গরুগুলোর চরে খাওয়ার মতো উপযুক্ত জমি আছে কী না, এ নিয়ে মাথাই ঘামায় না—তার কাছে কী করে আশা করব যে, সে সমগ্র দেশের জন্য কিছু ভাববে বা করবে? আজকের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় : দিনের বেলায় রাস্তায় সার সার আলো জ্বলছে, অথচ লক্ষ লক্ষ শহরবাসীর কেউ উদ্যোগ নিচ্ছে না বিদ্যুৎ-দপ্তরে একটি ফোন করতে—এরকম মানুষদের কাছ থেকে কি দেশের জন্য কোনও উন্নত ভাবনা বা বাস্তব কর্ম প্রত্যাশা করা যায়? অর্থাৎ জাতীয়তার জাগরণে প্রথম পদক্ষেপ হল : পরিবারের বাইরে যে-সমাজ আছে, তার জন্য ভাবা বা করা। সেইজন্য নিবেদিতা বলছেন : মা, বাবা, শিক্ষক, শিক্ষিকা, গুরুজন প্রভৃতি প্রত্যেকের কর্তব্য—আমাদের ঘরের, পাড়ার, বিদ্যালয়ের শিশুদের নিঃস্বার্থ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া। প্রতিটি গৃহের খণ্ড খণ্ড নিঃস্বার্থতাগুলি মিলে গড়ে উঠবে এক সঙ্ঘবদ্ধ বিরাট নিঃস্বার্থতা। নিবেদিতা তাকে বলছেন 'organised unselfishness'। তিনি বলতেন, স্বার্থশূন্য মানুষই বজ্র অর্থাৎ বজ্রের মতো শক্তিধর। কাজেই, ওই সঙ্ঘবদ্ধ নিঃস্বার্থতার যে-অপরিমেয় মহাশক্তি হবে, তা দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রতিটি সমস্যাকে দূর করে এক মহান ভারত—যে-ভারত স্বামীজীর ঋষিদৃষ্টিতে দৃষ্ট মহা ভারত—সেই ভারতকে বাস্তব করে তুলবে। কাজেই বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার জাতীয়তার ভাবনা রূপায়ণের প্রথম পদক্ষেপটি হল নিজে নিঃস্বার্থ হয়ে অন্যকেও নিঃস্বার্থ হতে প্রেরণা দেওয়া। নিঃস্বার্থ হওয়ার আন্তরিক প্রয়াস অন্তরে যে-শোধন ঘটাবে, তার দ্বারা জাতীয়তার অপরাপর মহান ও সূক্ষ্ম তাৎপর্যগুলিও আমাদের ভাবনা ও কর্মে ক্রমশ বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে।

নিবেদিতা তাঁর জাতীয়তার দর্শনকে 'আবিষ্কার' করেছিলেন তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের 'পরিণত' অবস্থায়—যখন স্বামীজীর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্যলাভের মহার্ঘ্য পর্বটি সদ্য অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন ব্রহ্মচারিণী ত্যাগব্রতী-জীবন পালন করে চলেছেন পরম নিষ্ঠায়, যখন 'বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি' শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা-করুণা লাভ করে চলেছেন অবিরত, যখন কাছ থেকে দেখে চলেছেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরেণ্য সন্ন্যাসীদের, যখন ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গেও তাঁর বেশ কয়েকবছর ধরে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ঘটে গেছে, ভারতের জাতীয়-জীবনের বেশ কিছু পুরোধার সঙ্গেও তাঁর আন্তরিক ও বৌদ্ধিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং তাঁদের ভারতদৃষ্টি সম্বন্ধেও তিনি অবহিত। বিভিন্ন মাত্রার এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর নিয়মিত আধ্যাত্মিক চর্চা ও মননশীলতার ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় সৃষ্ট নিবেদিতার জাতীয়তা-দর্শন। কাজেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। ভারত-অনুরাগী, বিবেকানন্দ-অনুরাগী যেকোনও মানুষেরই কর্তব্য হওয়া উচিত নিবেদিতার জাতীয়তা-ভাবনার অনুধাবন ও তার বাস্তবায়নের প্রয়াস। ✠